XXCE

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

৯৯ বর্ষ ৬৯ সংখ্যা সোমবার ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ কলকাতা

## অন্নচিন্তা

খাদ্য দফতরের ভান্ডারে চাল আসিবে কোথা হইতে, তাহার চিন্তা শুরু হইয়াছে। এ রাজ্যে এমন চিন্তা অভিনব। গণবণ্টন ব্যবস্থা, মিড-ডে মিল, অঙ্গনওয়াড়ি, সকল প্রকল্পের প্রয়োজন মিটাইয়াও খাদ্য দফতরের গুদামগুলিতে চাল উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়। এই বৎসর চিত্র বদলাইয়াছে। মহামারি ও লকডাউন-জনিত কর্মহীনতা সরকারি সহায়তার উপর নির্ভরতা বাড়াইয়াছে। রাজ্য সরকার ছয় মাস বিনামূল্যে চাল দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই আরও অধিক মানুষকে আরও অধিক পরিমাণে চাল দিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। এ রাজ্যে বর্তমানে বিবিধ খাদ্য সহায়তা প্রকল্পে যত চাল বিতরণ করা হইতেছে, তাহা স্বাভাবিক সময়ের দ্বিগুণ। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিয়াছে, দ্রুত চাল সংগ্রহের নীতি কী হইবে? এখনও অবধি চালের ঘাটতি নাই। বোরো ধানও উঠিবার সময় হইয়াছে। রাজ্যে দুই কোটি টনের অধিক ধান উৎপন্ন হয়, তাহার ত্রিশ শতাংশ বোরো ধান। ফলে, ধান আছে। প্রশ্নটি খরিদ নীতির। সরকারি ক্রয় কেবল উপভোক্তার স্বার্থে নহে, চাষির স্বার্থেও বটে। বস্তুত, গত কয়েক বৎসরে চাষির ন্যায্য মূল্য পাইবার প্রশ্নটি রাজনীতির কেন্দ্রে আসিয়া পড়ায় সরকারি ক্রয়ের ব্যবস্থাপনায় গণবণ্টনে চাল বিতরণের লক্ষ্য যেন তুলনায় পিছনের সারিতে। মুখ্য হইয়াছে চাষির নিকট ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পৌঁছাইবার লক্ষ্য। গত বৎসর রাজ্যে ১২ লক্ষেরও অধিক চাষি সরকারের নিকট নাম নথিভুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের হইতে সরকার ৩৪ লক্ষ টন ধান খরিদ করিয়াছে সহায়ক মূল্যে। শিবির করিয়া ধান ক্রয়, পরিবহণ, অতঃপর চালকলগুলি হইতে ধান সংগ্রহ, চাষির নিকট ক্রয়মূল্য পৌঁছানো— এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সময়, পরিশ্রম ও খরচসাপেক্ষ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসিবার পর সেই প্রক্রিয়াটি লইয়া বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইয়াছে। সরকারি গুদামের সংখ্যা বাড়িয়াছে, সরকারের দ্বারা সংগৃহীত ধানের পরিমাণও। এখন অতিমারি-জনিত আপৎকালীন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠিতেছে, সরকার কি এই দীর্ঘ ও জটিল পদ্ধতি মানিয়াই ধান সংগ্রহ করিবে? প্রশ্ন শুধু সময়ের নহে, খরচেরও। চাষিকে ধানের ন্যায্য মূল্য দিবার ফলে সরকার যে দামে চাল কেনে, তাহা বাজার মূল্য হইতে চড়া। রাজকোষে অর্থ লইয়া টানাটানি, ফলে বাজার হইতে স্বল্প মূল্যে চাল কিনিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। কিন্তু চাষির স্বার্থ দেখিবার প্রয়োজনও কি এখনই সর্বাধিক নহে? লকডাউনের ফলে পরিবহণ ব্যবস্থা ব্যাহত হইয়াছে, ফল-ফুল-আনাজ বিপণনে বিপুল ক্ষতি হইয়াছে চাষির। বাংলার চাষির প্রধান উৎপাদন ধান। সরকারি মূল্য ধানের বাজারকে প্রভাবিত করে বলিয়া সকল চাষিই সরকারি ক্রয়ের কিছু সুবিধা পায়। এই দুর্দিনে আরও অধিক সরকারি ক্রয় চাষিকে আশ্বস্ত করিবে, সন্দেহ নাই।

সংবাদে প্রকাশ, এফসিআইয়ের গুদাম, কিংবা খোলা বাজার হইতে চাল সংগ্রহের তুলনায় চাষির নিকট অধিক ধান কিনিতে উৎসাহী খাদ্য দফতরও। সংশয়, অধিক ক্রয়ের সুযোগ লইয়া দুর্নীতি বাড়িবে না তো? গণবণ্টনে প্রাপ্ত স্বল্প মূল্যের বা বিনা মূল্যের চাল বিক্রয় করিয়া দেন অনেক গ্রাহক, তাহাই ফের অসাধু ব্যবসায়ীর দ্বারা 'ন্যায্য মূল্যে' সরকারের নিকট ফিরিয়া আসে। ভুয়া খরিদের আরও নানা দৃষ্টান্ত ধরা পড়িয়াছে বারবার, অনেক চালকল মালিকের নাম কাটিয়াছে সরকার। রাজনৈতিক স্বজনপোষণের অভিযোগও উঠিয়াছে। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে নিয়মিত নজরদারি শিথিল হইবার সুযোগে দুর্নীতি বাড়িবার ঝোঁক থাকে, কাজেই বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। এখনও ধানের অভাব নাই, কিন্তু সরকারি ক্রয়ে ভ্রান্ত নীতি এবং দুর্নীতি চাষির বিপন্নতা বাড়াইলে কৃষির বাজার বিপর্যস্ত হইবে। তাহাতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিপদ বাড়িবে।

## সংস্কার কোন পথে

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে প্রস্তাব জমা দিয়াছে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি)। শুরু হইয়াছে স্কুলশিক্ষা

অভিজ্ঞতা বলে, ভয়ভীতির পরিবেশ দিয়ে উচ্চশিক্ষা হয় না

# আর এক গভীর অসুখ

মইদুল ইসলাম

কোভিড-১৯ আতঙ্ক এমনই আকার ধারণ করেছে যে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় এখন খুলতে পারছে না। ছাত্রছাত্রীদের প্রবল অসুবিধা। কিন্তু প্রশ্ন সেটা নয়। প্রশ্ন হল, করোনা পরিস্থিতি যখন একটু আয়ত্তের মধ্যে আসবে, সেই করোনা-উত্তর সময়েও কি দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আমাদের নেতা-মন্ত্রীরা ঠিক নীতি গ্রহণ করতে পারবেন?

আসলে, করোনা-নিরপেক্ষ ভাবেও আজকের বিশ্ব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। ভারতও তার সঙ্গে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এখন রাজনৈতিক উপরমহলকেই যদি শিক্ষানীতি তৈরি করতে হয়, তা হলে আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষায় পরিবর্তন আসবে কী ভাবে তা নিয়ে তাঁদের রীতিমতো সচেতন হওয়া দরকার। সেটা না ঘটায়, আমাদের দেশে এখনও মান্ধাতার আমলের শিক্ষানীতিই চলছে, যা একবিংশ শতাব্দীর গতি ও প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। শিক্ষানীতির পরিবর্তন কোনও রাজনৈতিক পার্টির মতাদর্শ অনুযায়ী হওয়া উচিত নয়। বরং এই শতকের নতুন কর্মক্ষেত্রের চাহিদা পূরণ করতে হলে দরকার এমন একটি উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা, যা একেবারেই পার্টি-সংযোগহীন।

এই কাজের জন্য দুটো শর্ত প্রয়োজন। এক, উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারের নাক গলানো বন্ধ করা। দুই, বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্ত পরিবেশ গড়তে হলে ছাত্র, অধ্যাপক, কর্মচারী এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। দ্বিতীয় শর্ত, অর্থাৎ সু-পরিবেশ গড়ে তোলা তখনই সম্ভব যখন প্রথম শর্তটি পূরণ হবে। বামফ্রন্ট জমানায় উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে একটি অলিখিত পার্টিতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ছিল। তৃণমূল জমানার শুরুর দিকে উচ্চশিক্ষাকে পার্টিতন্ত্র থেকে সরিয়ে আনার কিছু প্রচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু কয়েক বছর পর দেখা গেল, বামফ্রন্টের অনুকরণ করতে গিয়ে এই জমানাতে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় একটি নতুন সমস্যা তৈরি হয়েছে। সেই সমস্যা হল, কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট জমানার পুরনো ভদ্রলোক এলিটদের বিরুদ্ধে নব্য এলিটদের চোখরাঙানি। পাশ করিয়ে দেওয়ার আন্দোলন, শিক্ষক নিগ্রহ এবং ছাত্র রাজনীতির নামে বালখিল্য সব দাবি, এবং সব ধরনের অভদ্রতা।

জনগণের করের টাকায় চলা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মাইনে দিচ্ছি বলে যা বলছি তা-ই শুনতে হবে' গোছের হুকুমদারি মাঝেমধ্যেই শোনা যাচ্ছে। শুধু বিভিন্ন রাজ্যে নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীসান্ত্রিরাও এই রকম বলে যাচ্ছেন। কেউ আবার পরিষ্কার করে সে কথা না বললেও হাবেভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আসলে, উচ্চশিক্ষা নিয়ে তাঁদের চিন্তা কম, কারণ সেখানে ভোট কম। আর যেখানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে বা নতুন করে তৈরি হচ্ছে, সেখানে বিভিন্ন রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের বহু ক্ষেত্রে হরেক রকমের সরকারি ভীতি প্রদর্শনের নীতি অবলম্বন তো চলতেই পারে। সামাজিক মাধ্যমে তাদের নামে কুৎসা ও অপপ্রচারও শুরু হয়েছে।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সব রকমের মানুষ থাকার কথা। মতাদর্শগত ভাবে কেউ দক্ষিণপন্থী হতে পারেন, কেউ বামপন্থী। মতাদর্শের ভিন্নতা এবং মতপার্থক্য কেবল বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেই নয়, যে কোনও বিভাগের মধ্যেও থাকা সম্ভব, এমনকি সেটা প্রয়োজনীয়ও বটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে 'অক্সব্রিজ'-এর রাজনীতি বিভাগেই চূড়ান্ত মতাদর্শগত পার্থক্য রয়েছে। ঘটনা হল, একই মতের মানুষ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হয় না— রাজনৈতিক দল হয়। একে অপরের থেকে শেখা এবং জানা কোনও ভুল কাজ নয়। চাই গণতান্ত্রিক পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার মানসিকতা এবং নতুন কর্মসংস্থানের জন্য শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তি সঞ্চার করার আগ্রহ।

ভয়-ভীতির পরিবেশ দিয়ে শিক্ষা, বিশেষত উচ্চশিক্ষা, হয় না। শাসন এবং নিয়মের মধ্যে যেমন পার্থক্য করতে হয়, তেমনই দ্বিমত আর রাজনীতির মধ্যেও ফারাক করা দরকার। কানপাতলা রাজনীতিবিদরা যদি উচ্চশিক্ষার উপরে ছড়ি ঘোরান, তা হলে উচ্চশিক্ষার অবস্থা কী হতে পারে সহজেই অনুমেয়। অমুক পার্টি এখন ক্ষমতায়, তাই বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে একমাত্র সেই পার্টিরই লোক বসবে, এহেন বিধান দিয়ে আর যা-ই হোক উচ্চমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলে না। আবার, অমুক ব্যক্তি সাবধানী, সতর্ক থাকতে চান বলে আজ যে পার্টি ক্ষমতায় আছে, তিনি কার্যত সেই পার্টির দালালি করবেন, সেটাও ঠিক কাজ হতে পারে না। রাজনৈতিক মতবাদ এক জিনিস, আর 'আইন' মেনে কাজ করা আর এক। দুটোকে গুলিয়ে ফেলেন যাঁরা, তাঁরা হয় আহাম্মক নয় সুযোগসন্ধানী।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়তে হলে যেমন খোলা মাঠ বা খেলাধুলো করার জায়গা দরকার— ঠিক তেমন জরুরি উদারমনা পরিবেশ। দুইয়ের অভাবেই বিভিন্ন রকমের কলুষ মনের মধ্যে বাসা বাঁধে। নতুন প্রজন্মের শিক্ষানুরাগীদের মধ্যে ভিডিয়ো গেম ও সামাজিক মাধ্যমে বেশি সময় ব্যয় করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এই সব কারণে দেখি, ছাত্রছাত্রীদের রাতে ঘুম কম হয়, মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটে। এটা উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত দিনযাপন নয়। দীর্ঘ বই বা নিদেনপক্ষে-প্রবন্ধ মন দিয়ে পড়তে হলে শুধু সামাজিক মাধ্যমে পড়ে থাকলে হবে না। আর সামাজিক মাধ্যমে অহরহ নিজের মনের ক্ষোভ-জ্বালা-যন্ত্রণা ব্যক্ত করে শিক্ষাজগতের সমস্যাও মিটবে না। সামাজিক মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু আবার তত গুরুত্বপূর্ণও নয়। অথচ এর সাহায্যে এখন যে কোনও ব্যক্তিকে টার্গেট করে ভিলেন বা হিরো বানানো বড্ড সহজ। প্রত্যেক মুহূর্তে একটি করে রায় দেওয়া হয়, টিপ্পনি কাটাও সহজ। প্রত্যেকেরই সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া সহজ। অথচ এই বিশ্বে এক দিকে যেমন আন্তঃবৈষয়িক শিক্ষা ও গবেষণা এগিয়ে গিয়েছে, তেমন নতুন নতুন ক্ষেত্র ও বিশেষজ্ঞের প্রভাবও বাড়ছে। ইন্টারনেট থাকলেও তাই যে-কেউ সবজান্তা হয়ে যেতে পারে না।

এই সব কিছুর মধ্যে আসলে একটা বড় সঙ্কটের চিহ্ন আছে। সাফল্যের জন্য ধৈর্য যে একটি মৌলিক বস্তু, তা আজ বিস্মৃত, সেটা শেখানোর মতো মানুষও দ্রুত বিলীয়মান। অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা না বাড়িয়ে নিজের কাজে মন দেওয়ার পরিবেশটাই আজ আর খুঁজে পাওয়া ভার। এখন না-হয় চার দিক স্তব্ধ, সব কাজ করোনার ফলে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু গত কিছু কাল ধরেই কি আমরা এই এলোমেলোর মধ্যে বাঁচছি না? শিক্ষাজগতে দেখি, বেশির ভাগই কাজ করেন না, আর যাঁরা করেন, তাঁদের পথ রোখার জন্য লোকের অভাব নেই।

কেউ বলতে পারেন, এই সব নিয়ে কি শুধু নিন্দা করলেই কাজ হবে? নিশ্চয়ই হবে না। তবে নিন্দা না হোক, সমালোচনাটা থাকতে হবে। সেটাও না থাকলে সঙ্কট থেকে বেরোনো যাবে কী করে? নিন্দা না থাকলে পৃথিবীকে তার হৃত গৌরবের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাটাও করা সম্ভব নয়। নিন্দুক অনেক সময় শুধু নিন্দা করেন না, সমালোচনার মধ্যে দিয়ে নতুন পথ খুঁজতে বলেন। মুশকিল হল, শিক্ষা-অশিক্ষা-কুশিক্ষা নিয়ে একেই কেউ ভাবতে আগ্রহী নন, তার উপর এই দেশে অন্য রকম কোনও ভাবনাচিন্তা শুনলেই মনে করা হয় নিশ্চয় একটা কোনও অভিসন্ধি আছে!

রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলকাতা

## সম্পাদক সমীপেষু

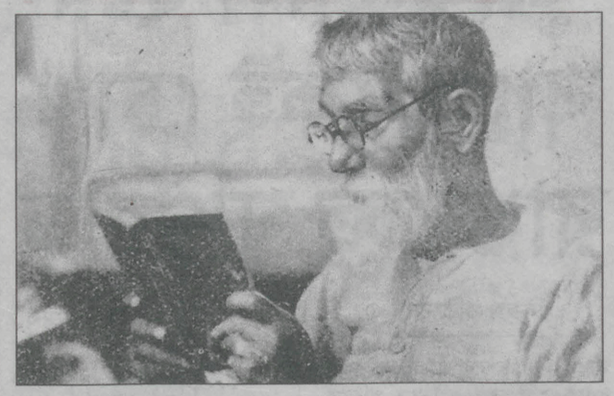



### আচার্যের দেশসেবা

'ঐতিহ্য' (১১-৫) সম্পাদকীয়তে পড়লাম, "১৯২২ সালের ভয়াবহ বন্যায় সমগ্র বাংলা ঘুরিয়া তাঁহার অর্থসংগ্রহ এবং ত্রাণকার্য ছাত্রদের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সমাজমাধ্যমে জানাইয়াছে, প্রফুল্লচন্দ্রের স্থাপিত দৃষ্টান্তই তাহাদের ঐতিহ্য।" প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মূল মন্ত্র ছিল দেশসেবা। চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে লিখছেন, "প্রিয় ভগিনী, আমি আপনাকে নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, যখন বিজ্ঞান চর্চা করি, তখন বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া দেশকেই সেবা করি। আমাদের লক্ষ্য একই, ... আমার জীবনের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই।" শুধু ১৯২২ নয়, তার আগের বছর চতুর্থ বার ইংল্যান্ড ভ্রমণ শেষে দেশে ফেরার পর, খুলনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের খবর পান। আত্মচরিতে তিনি লিখছেন, "...দুর্গতদের সেবাকার্যের ব্যবস্থা এবং দেশবাসীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিলাম। দেশবাসী সর্বান্তকরণে সাড়া দিল— যদিও গবর্নমেন্ট সরকারীভাবে খুলনার দুর্ভিক্ষকে স্বীকার করেন নাই।"

খুলনার রেশ কাটতে না কাটতেই ২২ সেপ্টেম্বর ১৯২২ থেকে অতিবর্ষণে আত্রেয়ী নদীতে জলস্ফীতির জন্য বগুড়া, পাবনা ও রাজশাহিতে বন্যা হয়। দুর্গতদের সাহায্যার্থে গঠিত হল বেঙ্গল রিলিফ কমিটি। আচার্য রায় হলেন সভাপতি। আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন, "বিজ্ঞান কলেজের প্রশস্ত গৃহে বন্যা সাহায্য সমিতির অফিস করা হইল এবং অপূর্ব উৎসাহের চাঞ্চল্যে ঐ বিদ্যামন্দিরের নীরবতা যেন ভঙ্গ হইল। দলে দলে নরনারী ঐ স্থানে যাতায়াত করিতে লাগিল। প্রায় সত্তর জন স্বেচ্ছাসেবক— তাহার মধ্যে কলিকাতার কলেজসমূহের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকও ছিলেন— প্রত্যহ সকাল হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অনবরত কার্য করিতেন।"

আচার্য সেবাকর্মে বিপুল সাড়া পেয়েছিলেন। কারণ, সর্বত্যাগী মানুষটির প্রতি দেশবাসীর বিশ্বাস ও আস্থা। প্রত্যেকেই জানতেন, তাঁদের দানের সদ্ব্যবহার হবে, একটুও এদিক ওদিক হবে না। বন্যাত্রাণে আচার্য রায়ের সাফল্যের কথা লোকমুখে প্রচারিত হতে থাকে। কিন্তু তিনি বলেন, "এই ব্যাপারে আমার নাম যে সমধিক প্রচারিত হইয়াছে, এজন্য আমি কুণ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে আমি নামমাত্র কর্তা ছিলাম।"

এর পরও ১৯৩১-এ ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকায় ভয়াল বন্যাতেও আচার্য রায় ৭০ বছর বয়সে সেবাকার্যের হাল ধরেছিলেন। আত্মচরিতে লিখেছেন, "প্রধানতঃ কাঁথি ও তমলুক হইতে আগত একদল স্বেচ্ছাসেবক আমাদের কার্যে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। বন্যার প্রথম অবস্থায় বিধ্বস্ত অঞ্চলে কলেরা ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু এই সমস্ত ত্যাগী কর্মীরা "অজ্ঞাত যোদ্ধার" মতই সে বিপদ গ্রাহ্য করেন নাই।"

**নন্দগোপাল পাত্র**
*সটিলাপুর, পূর্ব মেদিনীপুর*

### ফুটপাত গায়েব

দমদম সেভেন ট্যাঙ্কস (সাত পুকুর) মোড় থেকে চিড়িয়ামোড়ের দিকে যাওয়ার বাঁ দিকের ফুটপাতের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। পায়রার খাঁচা, হাঁস-মুরগির খাঁচা ছাড়াও অন্যান্য অনেক কিছুর সাহায্যে ফুটপাতটি প্রায় সম্পূর্ণ রূপে দখল করে রাখা হয়েছে। এমনকি ফুটপাতের উপর প্রায়ই একটি বাঁদরও বাঁধা থাকে।

**অমিত দাস**
*কলকাতা-৩০*

### নিজের টাকা

গত ২৩ মার্চ আমার ম্যাচিয়োর্ড ফিক্সড ডিপোজ়িট নিয়ে, ভাঙাবার উদ্দেশ্যে, ব্যাঙ্কে যাই। জানতে পারি, আপাতত এই সব পরিষেবা বন্ধ আছে। আজও এই পরিষেবাগুলি

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে ভেঙে দিচ্ছে, তারই অঙ্গ হিসেবে রেলেও বিভিন্ন বিভাগে কর্মী ছাঁটাই চলছে। ইতিমধ্যেই রেলের প্রিন্টিং প্রেস তুলে দেওয়া হয়েছে ২০১৮ সালে, বহু বিভাগকে ধীরে ধীরে বেসরকারিকরণের দিকে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাই আশঙ্কা, 'শ্রমিক স্পেশাল' বা 'কোভিড স্পেশাল' ট্রেন চালানোর পাশাপাশি আরও কিছু বিভাগ তুলে দেওয়ার মহড়া হচ্ছে না তো? টিকিট চেকার ব্যতিরেকে ট্রেন চালানোর অভূতপূর্ব আদেশে বহু রেল কর্মচারীই 'সিঁদুরে মেঘ' দেখছেন।

**সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়**
*কলকাতা-৬১*

### দিন বাড়ান

আমি ত্রৈমাসিক রেল টিকিটের গ্রাহক। আমার বর্তমান টিকিটের ভ্যালিডিটি মার্চ থেকে জুন অবধি।